জিবন থেকে নেয়া বিজয়ের স্মৃতিচারণ

হারুন রশীদ আজাদ (সিডনি)

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ,
দেশ হাসে মোর মা হাসে ।

হাইস্কুলে লেখাপড়ারত আমার ছাত্র জীবন , সফল গণ অভ্যুত্থানে উত্তাল সারা বাংলাদেশ !লেখাপড়ার প্রতি কোন মনযোগ নেই ।হৃদয়পটে শুধু একটি ছবি , বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব , আর সপ্নের সোনারবাংলা ।মা পাঠাতেন স্কুলে আর আমি থাকতাম মিছিলে ! এ ভাবে সময় গড়িয়ে এলো গণ আন্দোলনের সফলতা ৬দফাদাবি মেনে নিয়ে জেঃ ইয়াহিয়া খান জনগনের ভোটে ৭০'র সাধারন নির্বাচন হবে ঘোষনা দিলেন ।পাকিস্তানের মানুষেরা সপ্নদেখল জনগনের ভোটে পাকিস্তানে নির্বাচিতসরকার গঠিত হবে , গণতান্ত্রিক সরকার পাকিস্তান শাসন করবে । বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ১৯৬৬ সালের ৫ই ফেব্রোয়ারি জেঃ আইয়ুব খাঁনের সাথে মিলিত গোলটেবিল বৈঠকে উত্থাপন করেন ৬দফা ।জেঃ আইয়ুব খাঁন ক্ষমতা থেকে বিদায় নিয়েছেন ১৯৬৯ সালের প্রথমার্ধে তবু বাঙ্গালী জাতির ''স্বাধীনতার সনদ '' ৬ দফা দাবি মানেনি ।কথায় আছে '' বিড়াল সহজে মান্দার গাছে উঠেনা '' ইয়াহিয়া খান ও সহজে ৬ দফা মানেনি , বহু হিসাব কষেছেন , ৬ দফা দাবির শর্তানুশারে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামি লীগের নৌকা প্রতিক সদস্যরা ১৬৭টি আসন পায় ।

আর সেই পাওয়ায় বাতাসে নৌকার পালে জয়বাংলার দোলা লাগে ।পাকিস্তানি সামরিক সৈরাচারি সরকার জেনে যায় , এবার ঢাকা হবে পাকিস্তানের প্রানকেন্দ্র । সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাবিতে জাতিয় সংসদ , রাজধানী ,কুটনৈতিক পাড়া , সবই চলে যাবে ঢাকায় । সেইঅসহ্য যন্ত্রনার কারখানায় জড়ো হয় জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল (পিপিপি) ১লা মার্চ জেঃ ইয়াহিয়া হঠাৎ সামরিক আইন পুনরায় জারি করেন । বঙ্গবন্ধু হোটেল পুর্বানীতে জরুরী পার্লামেন্টারি বৈঠক ডাকেন ৩রা মার্চ । রুদ্ধদার সেই বৈঠকেই স্বাধীনতার রুপরেখা তৈরি হয় ।বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের জানান আমার যা বলার ৭ই মার্চ বলবো । আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকবে ,পরর্বতি নির্দেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত সবকিছু অব্যাহত ভাবে বন্ধ থাকবে ।
আজকের ইতিহাসে ৭ইমার্চ সম্মন্দে আর বলার দরকার নেই ।

১৯৭১'র ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ থেকে সেচ্ছাসেবকবাহিনিতে যোগদেই ।সেখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় ।কেরানীগঞ্জের কালীগঞ্জ বাজারে আমরা আমজাদ হোসেনও শরীফুদ্দিন (সরফা)এর নেতৃত্বে ৯ই মার্চ আমরা বুড়িগঙ্গানদীতে লঞ্চ মিছিলের আয়োজন করি । সদরঘাট থেকে ফতুল্লা বরাবর গিয়ে আবার ফিরে আসি তখন সূর্যডোবা সন্ধ্যা ,সেই লঞ্চ মিছিলটি ফির তি পথে সদরঘাটস্থ সেনাদপ্তর বরাবর এলে সেনখান থেকে আমাদের লঞ্চ লক্ষকরে রাইফেল ও মেশিনগান দ্বারা আক্রমন করলে তিনজন গুলিবিদ্ধ হয় এবং আমাদের সঙ্গী আবুল কাশেম নামের এক নৌকার মাঝি তাৎক্ষনিক শহীদ হয় ।১০ই মার্চ সকালে তার মরদেহ নিয়ে আমরা বিক্ষোভ মিছিল বের করি ,পরে যথাযোগ্যমর্যদায় কালীগঞ্জখেজুরবাগ কবরস্থানে আবুল কাসেমকে দাফন করাহয় । আমরা তৎকালিন চুনকুটিয়া টেঘরিয়া সড়কের নামকরণ করি শহীদ আবুল কাশেম সড়ক ।অতপরঃ আমরা পালাক্রমে আইন শৃংখলা রক্ষাকারির ভুমিকা পালনকরি ।

২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সৈন্য দ্বারা রাজধানিতে ''অপারেশন ছার্চ লাইট৭১''নামদিয়ে গনহত্যা শুরু করে ২৬শে মার্চ ভোর থেকে,ঢাকাশহরে কার্ফিউ শিথিল করার সাথে সাথে ঘরছাড়া মানুষের ঢল নামে। নদী পার হয়ে আসতে শুরুকরা অজ্ঞ্যাত যাত্রার মানুষদের জন্য আমরা জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে তাদের আশ্রয় ও আহারের ব্যবস্থা হিসাবে ঘরে ঘরে গিয়ে চাল-ডাল সংগ্রহ করে রান্নাকরা খিচুরি পরিবেশন করি ।শহরে বিক্রির আশায় দুর-দুরান্ত থেকেআসা গোয়ালের দুধ কালীগঞ্জে আটকা পরে আমরা চার আনা ,আট আনা সের দরে কিনে শিশু-কিশোরদের জন্য আহারের যোগান দেই ।সেইদিনের করুন স্মৃতি আজ অনুভব করতে পারলে চোখ গড়িয়ে অশ্রু আসবেই !

অতপরঃ ঢাকাকে বাঙ্গালীজাতির কাছ থেকে নিরাপদ দুরে রাখতে ৯ই এপ্রিল ভোরে পাকিস্তানি বাহীনি কেরানীগঞ্জ থানার সীমানা চিহ্নিত করে পুর্ব ও পশ্চিমের শেষ সীমনা র‍্যাকি করে সমগ্র কেরানীগঞ্জ থানা ঘেরাও করে আক্রমন শুরুকরে ।গ্রামের মানুষ তখন ঘুমে , মোয়াজ্জিনের আযান তখন ও দেওয়া হয়নি । আমরা তখন খালের পার দিয়ে লাঠি হাতে রাত জাগা অতন্ত্র প্রহরি । হঠাৎ চাঁদের আলোতে খালের পানিতে একই মাপের মানুষের সারিবদ্ধ কাফেলা দেখি !আমরা গভীর রাতে প্রতিদিন অত্র এলাকার কাঠের ও বাঁশের সিঁড়ি গুলির মাঝের অংশ সড়িয়ে ফেলতাম । তাই ওরা খাল পার হওয়ার পথ খুজছিল হয়তো ।আমি একমুহুর্ত দেরি না করে পুর্ব পরিকল্পনা মত একজন অপর জনকে জরুরী বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে ঘরে ঘরে জানিয়ে দিলাম পাক হানাদার এলাকায় প্রবেশ করেছে আপনারা নীরবে পালিয়ে যান ।

প্রথমার্ধে সব কিছুই ঠিকমত চলছিল , কিন্তু পাকসেনারা যখন পুর্ব ও পশ্চিমের শেষ সীমানা থেকে তাদের সারাশি আক্রমনের দুটি কামানের গোলার শব্দে সংকেত দিয়ে রাইফেল ও মেশিন গানের অবিরাম গুলি করা শুরু করলো তখনই শুরু হল ,লাখ লাখ মানুষের গগণ বিদারিত চিৎকার । ঢাকা শহর ছেড়ে বুড়িগঙ্গার অপর পারে জনতা অপেক্ষা করছিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে শহরের নীজেদের ঘরে আবার ফিরে যাবে ।তা আর হলনা এবার শুরু হল আরও দুরে সরে যাওয়া ।সেদিন বিক্রমপুর অভিমুখি মানুষের কাফেলায় গরু ছাগল কুকুর কোন কিছুই বাদ ছিলনা ।আমরা ও পালিয়ে যাচ্ছিলাম অন্যদের সাথে ।পদ্মার পারে যেতে দুটি নদী পার হতেহয় ধলেশ্বরী তার একটি । সেই নদী পার হওয়ার সময় স্থানীয়দের হাতে হাজারো মানুষের সম্পদ লুন্ঠিত হল আমাদের চোখের সামনে । মন বিদ্রোহি হলেও আমরা নিজেরাই তখন যাযাবর ।পায়ে হেটে বিক্রমপুরস্থ লৌহজং থানাধীন কুমারভোগ ইউনিয়নের উয়ারী পৌছে ছিলাম ।

আমার বন্ধুছিল সাহেদ কালিগঞ্জের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ি কালুমুদির মেয়ের ঘরের নাতি সে ।সাহেদের ধারনা ছিল আমার আব্বার সাথে ওর বাবার বন্ধুত্বের সুত্রে হয়তো পরিবারের অন্যরা আমাদের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে । কিন্তু না ।কি আর করা আবার ফিরতে হল কালিগঞ্জের পথে । সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে এসেছে সমগ্র কেরানিগঞ্জ ভুভরে এলাকায় পরিনত হয়ে আছে ।সেই স্মৃতি মনে হলে এখনো দেহমন শিহরিত হয় ।তবু আসতে হবে এলাম , সাহেদদের বাড়ীর খুপড়ি একটি ঘরে আশ্রয় নিলাম দুজনে । সাহেদ

পরিবারের সদস্যদের চিন্তায় বিষন্ন !আমি পাকবাহিনীর হাতে ধরাপরে জীবন যাবে এই কল্পনায় আতংকিত !এভাবে তিন চারদিন ওদের বাড়ীতেই বন্দী অবস্থায় কাটালাম ।পরেরদিন আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের চাবি সাথে সেই সাহসে নদী পার হয়ে ওয়াইজ ঘাটস্থ আমাদের মুক্তাপ্রকাশনির দরজা খুলে টাকা হাতিয়ে ভারতে যাওয়ার চিন্তা শুরু করতে করতেই পুরানো বই ও কাগজ ক্রেতা-বিক্রেতা ফেরিওয়ালা একঝাকা বই নিয়ে আসে আমি বইগুলি দেখতেছিলাম । প্রতিটি বইয়ের পাতায় ইংরাজিতে লেখা ‘‘শেখ মুজিবুর রহমান মেম্বারঅব ইষ্ট পাকিস্তান পার্লামেন্ট ’’ আমি বিলম্ব না করে ১২আনা সের দরে কিনে নিলাম । এরই মধ্যে তৎকালিন জগন্নাথ কলেজের বোটানির অধ্যাপিকা শাহানা আপা আমাদের নিয়মিত কাষ্টমার এসে উপস্থিত ।তিনি দশ পর্বের রবীন্দ্র রচনাবলী নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন ।বঙ্গবন্ধু কোনদিন ফিরে এলে বইগুলি ফেরত দেওয়ার শর্তে তাকে রচনাবলীর সবকটি দিলাম । এরপর আবার দরজা বন্ধকরে বইগুলি ছালার ছটে বেধে বাড়ীর দিকে ছুটলাম ।
(বঙ্গবন্ধু ১০ই জানুয়ারি ১৯৭২ এ পাকিস্তানের বন্দীখানা থেকে ফিরে আসার পর আমরা উভয়েই তা ফেরত দিয়েছিলাম)

ফিরে আসি যুদ্ধে যাত্রার ইতিকথায় ।১৯৭১‘র১৫ই এপ্রিল পিতার ওয়াইজঘাটস্থ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ও মায়ের দেয়া ১২০ টাকা নিয়ে গ্রামের বাড়ী থেকে আমার আব্বার চাচাত ভাই আঃ আউয়াল (মরহুম) ও তার বন্ধুদের সাথে নদীপথে নৌকাযোগে ভারতের উদ্দ্যেশে পথে মাত্রা শুরুকরি ।তিনদিন পরে আখাউরা সীমান্ত দিয়ে ভারতের ভুমি স্পর্সকরি । আমাদেরকে গাইড করে নিয়ে যান ময়মন সিংহের এক পুলিশ অফিসারের ছেলে চঞ্চল আংকেল (আউয়াল কাকার বন্ধু) সীমান্তে পৌছার সাথে-সাথে সামরিক ট্রাকে করে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় আগরতলা কংগ্রেস ভবনে । সেখানে নাম ঠিকানা লিপিবদ্ধ করার সময় আমার বয়স নিয়ে সেখানকার কর্তৃপক্ষের সন্দেহ সৃষ্টি হয় ।আমার কাকা আঃ আউয়াল দিব্যিকরে আমার আমার বয়স ১৮ বলে সত্যায়ন করেন ।চঞ্চল আংকেলও তাতে সাক্ষী হন ।এছাড়া আমার বয়স প্রমানের কোন পথও ছিলনা ,আর তা ব্যর্থহলে সামরিক প্রশিক্ষন পাওয়া হতনা আমাকে নাকি ওরা শরনার্থি শিবিরে পাঠিয়ে দিত !

এরপর আমাদেরকে বিশাল গড় পাহাড়ে নতুন গড়া হচ্ছে অবস্থা একটি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষন শিবিরে নামানো হয় ।সেই ক্যাম্পের প্রধান ছিলেন ভারতিয় সেনা কর্মকর্ত্তা ক্যাপ্টেন শর্মা ।সিভিল ইনর্চাজ ছিলেন এক আওয়ামি লীগ এম পি কিংবা শীর্ষনেতা নাম মনে নাই ,তবে বেশ উঁচু মাপের এবং সামনের দাঁত গুলি উঁচু ।কুমিল্লা কিংবানোয়াখালী জেলার বাসিন্দা হবেন ।পরের দিন থেকেই শুরু হয় শাররিক কসরৎ ও প্রশিক্ষন ।জীবনে প্রথম সামরিক প্রশিক্ষনে জানানো হল রাইফেল এর পুরো নাম ‘‘লী এন্ড ফিল্ড শর্ট ম্যাগজিন পয়েন্ট থ্রী নট থ্রী মার্ক থ্রী নাম্বার ওয়াপ রাইফেল ’’ এভাবে গ্রেনেড , মাইন , ষ্টেনগান,এল এম জি ,এরপর ফিল্ডে নিয়ে প্রেক্টিক্যাল প্রশিক্ষন দেওয়া হয় ।প্রশিক্ষন শেষে স্থবির অবস্থা বিরাজ করছিল কখন অস্ত্র হাতে ।বাংলাদেশ সীমানায় প্রবেশ করবো ।

এমতাবস্থায় একদিন তৎকালিন ক্যাপ্টেন হায়দার ভাই আমাদের ক্যাম্পে আসেন , বিকালে ভলিবল খেলে আমাদের ক্যাম্প প্রধান ক্যাপ্টেন শর্মাকে প্রস্তাব দেন প্রশিক্ষন শেষ হয়েছে এমন কিছু যোদ্ধাকে তিনি দেশের অভ্যন্তরে নিয়ে যেতে চান । শর্মা তাতে রাজি হননা ।একপর্য্যায়ে ইংরাজিতে বেশ কথা কাটা-কাটি হলে আমরা বুঝতে পারি কাউকে ক্যাম্পের বাইরে যেতে দেওয়া হবেনা ।

অতপরঃ হায়দার ভাই বাংলায় ও আকারে-ইঙ্গিতে আমাদেরকে জানালেন যারা দেশে ঢুকতে আগ্রহি আজ রাতেই তারাযেন ক্যাম্পথেকে বেড়িয়ে পরি ।সেই পরামর্শ অনুযায়ি আমরা এক প্লাটুনের কম একটি দল পালিয়ে বাইরে অপেক্ষমান হায়দার ভাইয়ের সাথে যোগ দেই । দেশের অভ্যন্তরে হায়দার ভাই আমাদেরকে তার বিভিন্ন এলাকায় ভাগকরে পাঠিয়েদেন আমাকে পাঠানো হয় অবঃ ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরির কাছে ।আমি ও খুশি হই কারণ আমাদের লৌহজং এলাকায় শাহ মোয়াজ্জেম এর আত্বীয় ইকবাল (কমান্ডার দাবীদার)এর সাথে একটি পারিবারিক শত্রুতার কারণে ,মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে পারিবারিক দন্দ্বের কারণে শত্রুতা বাড়তে পারে ।
অতপরঃ ক্যাপ্টেন অবঃ হালিম চৌধুরীর নির্দেশে মানিক গঞ্জের শহরতলি এলাকায় অজ্ঞাত স্থানে অবস্থান নেই । যুদ্ধকরি গালিমপুর , ঘিউর , সহ অজ্ঞাত আরো দুটি অপারেশনে অংশনেই । পাখী ভাই অবঃ ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরির খুব কাছের মানুষ ছিলেন ।ডাঃ রহমান নামের একজনকেও এখনো মনে আছে ।এই মুর্হুতে এরচেয়ে বেশী কিছু মনে পরছেনা । ঢাকা নারায়ন গঞ্জের পথ ঘাট চেনা মুক্তিযোদ্ধাদের খোজা হচ্ছে বার্তাপেয়ে আমাকে সহ ফরিদপুরের ছেলে নারায়ন গঞ্জে বসবাস করা আরেক হারুন ,বাবুল,ও আমাকে পাঠানো হল ।
এরপর আবার আসতে হল নারায়নগঞ্জে বাচ্চু ভাই নামের এক কমান্ডার আমাদেরকে মুন্সীগঞ্জ ও নারায়নগঞ্জ এর মধ্যবর্তি কলা গাইচ্ছা চরে তার সঙ্গীদের পাঠালেন , মিত্র শক্তি ভারত তখন প্রচন্ড আকাশও মাটিতে আমাদের পেছনে উপস্থিত ।আমরা নি র্দিষ্ট স্থানে পৌছার আগেই শীতলক্ষায় অবস্থানরত একটি গমবাহি জাহাজ , ও দুটি সামরিক গানবোর্ড থেকে এলোপাথারি মেশিন গানের গুলি ও হেভি মটারের গোলা ছুঁড়তে লাগল । আমরাও জয়বাংলা বলে চিৎকার করে গুলি ছুড়তে ছিলাম । এরই মধ্যে ঢাকায় বোমা ফেলে ফেরা ভারতিয় মিত্র বাহিনীর বোমারু বিমানের ঝাঁক আকাশে দেখাগেল , বিমানগুলি একঠি চক্কর মেরে বিশাল লম্বা ধোঁয়ার কুন্ডলি সৃষ্টি করে সেই ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে সোজা গমবাহি জাহাজটিও গানবোর্ড দুটি তে বোমার আঘাত হানলো । মুহুর্তে ধাউ ধাউকরে আগুন জ্বলে উঠল ! আমরা জয়বাংলা ধ্বনি দিতে দিতে এস এল আর ,রাইফেল ,ও ষ্টেনগানের গুলির বৃষ্টি ঝড়ালাম ।
তখন ঢাকা দখলের সপ্ন আর বিজয় কেতন হাতে মুক্ত ভুমিতে উল্লাসের অপেক্ষা ছিল মাত্র ।এরপর আর আমাদেরকে যুদ্ধকরতে হয়নি । তিন দিনের মাথায় পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পন করে । আমরা নারায়ন গঞ্জের একটি ব্যাংক শাখার দোতলায় ক্যাম্পে উঠি আর প্রতিক্ষাকরি ঘরে ফেরার , ৮মাস পুর্বে ছেড়ে আসা মা-বাবা ভাই-বোনদের ছবি চোখের মনিকোঠায় ভাসতে থাকে । এরপর সিদ্ধান্ত হয় আমরা যারা ঢাকার ছেলে আমরা ডেমরা ধরে এগিয়ে আসা মিত্রবাহিনীর সাথে ঢাকায় প্রবেশ করবো কিন্ত ততক্ষনে মিত্রবাহিনী অনেকদুর এগিয়ে গেছেন ।আমরা অনেকটা পেছনে ! দুরথেকে দেখলাম বাংলাদেশ ব্যংকে আগুন জ্বলছে ।
অতপর মতিঝিল পৌছে দেখি ব্যাংকের বাইরে শত শত টাকার ট্রাংক ধাউ-ধাউ করে জ্বলছে , রাজপথে পাকসেনাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরে থাকা লাশ !!আমি সরাসরি আমাদের ঢাকার বাড়ীতে এসে জানতে পারি প্রান ভয়ে তারা অনত্র পাটুয়াটুলির রমাকান্ত নন্দী লেনে সরকারি চাকুরিজীবি আব্বার বন্ধুর বাড়ীতে অবস্থান করছেন ছুটে যাই সেখানে । দরজায় শব্দ করার সাথে মা দরজা খুলে এক মুহুর্ত অবাক চোখে চেয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠে ,আর সেই চিৎকারে উপরে ও নীচের তলা সহ ,আমার পরিবারের সবাই এসে ভীড় জমায় । সপ্তাহ পুর্বে ভুল সংবাদ শুনে যার গায়েবি জানা হয়েছিল সেই আমি হারুন রশীদ আজাদ জীবন্ত সবার সবার সামনে !!

আমার নিকটতম আত্নীয়ের মধ্যে যারা মুক্তিযোদ্ধা ,তারা হলেন , শহীদ মোছাদ্দেক হোসেন ভুঁইয়া সাভারের সম্মুখ যুদ্ধে শহীদ হন ,তারই বড় ভাই ডাক নাম খুশী (খুশীমামা)সেও একজন মুক্তিযোদ্ধা ।এছাড়া
কাকা আঃ আউয়াল (মরহুম) । কাকা আমজাদ হোসেন বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের ঢাকা মহানগরের সভাপতি , মামা মাহাবুবুল আলম অবসর প্রাপ্ত পুবালীব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার ।
ছোট কাকা আনোয়ার হোসেন (জমসের)কে পারিবারিক পুর্বশত্রুতার প্রতিশোধ হিসাবে তৎকালিন বিক্রমপুর এলাকার শীর্ষ নেতা কর্তৃক রক্ষীবাহিনী দ্বারা তাকে অসুস্থ, শয্যাশায়ি অবস্থা থেকে তুলে এনে ,তাকে দিয়ে কবর খুঁড়ে লৌহজং চরে জীবন্ত কবর দেওয়া হয় । আমার এক ফার্মাসিষ্ট মামা ,কয়েশ,ও তার ডাক্তার পিতাকে পুরানো ঢাকার টিপু সুলতান রোডের নিজস্ব ফার্মেসি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে পাক বাহীনির দালালেরা হত্যাকরে , পরে তাদের লাশ সুত্রাপুর লোহার পলের নীচে খাল থেকে উদ্ধার করাহয় ।

আজকের বাংলাদেশ যদি ৭১'র ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় কেতন না উড়াতে পারতো , কি হতে পারতো আজ একটু ভেবে দেখুনতো ! পাকিস্তানি সেনা বাহিনির সাথে আমাদের দেশের বিশ্বাস ঘাতকেরা গ্রামে শহরে যেভাবে পাকিস্তানিদের সাহায্যে সষর্ক্র হয়ে উঠেছিল তা আজকের প্রজন্মের কাছে না বললে আমরা মুক্তি যোদ্ধারা অপরাধি হয়ে যাব । সেই বিবেচনায় একটু ভেবে দেখতে অনুরুধ রাখছি , সেদিন দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ থাকলেও ধর্মীয় প্রতারকরা সে সময় আমাদের বিরুদ্ধে একটি শক্তি দ্বার করেছিল । রাজাকার , আল-বদর ,আল-শামস ,এই তিনটি সষর্ক্র শক্তিকে পাকিস্তানি বাহীনি রাষ্ট্রীয় ভাবে ব্যবহার করাতে মিত্র শ ক্তি ভারতের সাহায্য আমাদের জন্য অনিবার্য্য হয়ে উঠেছিল ।

তা না হলে আমাদের অবস্থা আজ ফিলিস্তীনিদের চেয়েও খারাপ থাকত ।৭১'র সেই যুদ্ধে আমাদের পরাজয় হলে শাস্তি হত মৃত্যুদন্ড ! তাই সেদিনের যুদ্ধে যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল তারা আমাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে পরাজিত শত্রু । আমরা মরে যাওয়ার পর এর গুরুত্ব কমে যাবে ,বাংলাদেশ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠত হয়েছে অনন্ত কালের জন্য । তারপরেও মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের মৃত্যুদন্ড চাইনা । চাই রাষ্ট্রীয় ভাবে গেজেট তৈরী করে রাষ্ট্র বাংলাদেশ এর চীর শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করণ ।ঐ তিহাসিক বিজয়ের অসমপাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করার উত্তরাধিকার সুত্রে দায়িত্ব বর্তায় দেশপিতার কন্যা হিসাবে আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপর ।

১৯৭৫ সালে ১৫ই আগষ্ট রাষ্ট্রের পট পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল এই একটি কারণেই । তাইতো আজ বীরউত্তম জিয়াউর রহমান ও তার বিধবা স্ত্রী শতগুনে গুনান্বিত হলেও ত্রিশ লক্ষ শহীদ আর সাড়ে চার লক্ষ ধর্ষিতা মা-বোনদের কাছে চীর অপরাধি । বর্তমান প্রজন্ম যতই সত্য জানতে শিখবে শত্রু ততই দুর্বল হয়ে একদিন বিলিন হবেই হবে !!তাই আজকের বিজয়ের মাসে যুদ্ধাপরাধি ঐ দালালদের বিচার অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে । দেশ-মাটির বিজয়ের পবিত্রতাকে আর শক্তিশালি করতে সোচ্চার হউন ! ঐক্যবদ্ধভাবে বলতে শিখুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের চীর শত্রুর বিচার চাই ! azad.banglamedia@gmail.com